তোমাকে

নির্মল চন্দ্র বর্মন
এ. ডি. এস. আর., ইটাহার

তোমার আমার না বলা কথাগুলো
না বলাই থেকে যায়
শরতের মেঘের মতন -তারা
সারা আকাশ ঘুরে-ফিরে
বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে
আমারই বুকে!

আমি জানি
পাবই তোমাকে—একদিন
গোধূলির মেঘ
আমার তাই প্রিয়—আলোমাখা
সারারাত ধরে চলে আমার
তোমাকে খোঁজা ঃ
পিঠে গুঁজি স্বপ্নের পাখা।

জানি জানি এমন যে হবে
যেখানেই থাকো নাকো তুমি
তোমাকে খুঁজতে গিয়ে
একা আরো একা
হ'তে হ'তে হ'তে
আরো আরো আরো আরো
একা হব আমি!

চাইতে যে কাছে আসে
জেনো;—
সে নয় সে নয়—সে তোমার নয়
সে জন থাকে দূরে
রয় শুধু বাঁশি সুরে
সে হয় সে হয়
সে তোমার হয়।

The Little Evil

Subir Majumdar
[S/o Subhas Chandra Majumdar, A.D.S.R, Barrackpore]

One day a little seed fell in our garden,
It grew in between two big trees, not nine or ten.
Other trees advised them not to shade it,
But they didn't care & fed it day & night.
Few days later, the bud shook its head with joy,
The two trees had pride upon their little boy.
The bud grew faster & became older,
The two trees smiled seeing it to be bolder.

But a few months later, they became sad,
Although they helped to grow it like mom & dad.
The new member of our garden was a banyan tree,
For whom all the trees felt danger & also not free.
The youngest member saw them & laugh–
At them & said "I' m the strongest & also tough".
It betrayed at them & grew more & more,
I notified & uprooted the lier to cure other's sore.

The evil is now dead & all the trees boon me,
As they become secure and also become free.
It is same as in the society of Human Being,
If those are restricted, it will be a fine thing.

গল্প

বুর্জোয়া পাখি

সৌমিত্র মণ্ডল

এ. ডি. এস. আর., ধূপগুড়ি

ছোটবেলা থেকে বাড়ি পালিয়ে যাওয়া আমার নেশা। যখন একটু বড় হলাম দেখি পালিয়ে গিয়েও ধরা পড়তে হয়। কৈশোরের গুটি ছেড়ে কলেজে এসে প্রজাপতির দলে মিশে গেলাম। ফুল হতে ফুলে বেড়ানো প্রজাপতির স্বভাব। আমার ভবঘুরে জীবনে সে স্বভাবের ব্যত্যয় হয়নি। ভবঘুরে জীবন যাপনের হালহকিকত নিয়ে যখন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বাধল তত্ত্ববিদের টানাটানি তখন থেকে প্রজাপতি স্বভাবের অবস্থা হল শোকাবহ। আমার শোকাবহ অবস্থা আমাকে ছাড়ল যখন চাকরি সূত্রে পরিচিত গণ্ডি ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেলাম। তবুও হিতকথার আনাগোনার অন্ত ছিল না। আমার ভবঘুরে পরিচয়টার ডানা ছেঁটে সংসারের দরকারি মহলে সিলমোহর দিয়ে পাকাপাকিভাবে স্থিত করার বাসনায় শুভানুধ্যায়িরা চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল।

জ্ঞানকাল থেকে বুঝেছি নির্জন নিঃসঙ্গের সঙ্গী আমি। স্বাভাবিক সম্পর্কগুলোও তাই বড়বেশি সেতুহীন। পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের কোলাহলে কখনো জমিয়ে বসতে পারিনা। বন্ধুরা ভাবে এড়িয়ে গেলাম। স্বজনরা ভাবে ভারি তো দেমাক। ফলে তিলেতিলে গড়ে ওঠা সম্পর্কের উষ্ণতা আমার জীবন হতে লোপাট। শুধু বুঝলাম সংসারর দড়িতে বাঁধা পড়ার মত আমি নই। আমার মনের কৈফিয়ৎ কেবল অপরিচিত পথের কাছে। আমি ও দিলাম হাল ছেড়ে। উপেক্ষিত পথের দাবিকে জানালাম সম্মান। প্রতিদিনের শূন্যতায় লাগে অনাহূত সুর। বিন্যস্ত সময় আমার অবিন্যস্ত ফাঁকা মনে রং লাগালো। সুর আর রং এর পরিপূর্ণ রূপে আমার আর কোনো অক্ষেপ থাকল না। ক্রমশঃ আমি যথার্তগুণী হয়ে উঠলাম। বলা যায় গুণ আয়ত্ত করলাম। সংসারর ফরমাশ মাথায় চেপে বললেও হৃদয় বিদ্ধ করল না। ফলে ভবঘুরে মনটিকে গেল। লোকাচার দেশাচার না মানার কটুক্তি অনেক শুনলাম তবে স্বধর্মে থেকে গেলাম। বেঁধেছি পথেই আমার পথের বাসা। কতদিন অজানা পথে নাম না জানা ফুলের সমারোহে চোখ ভরে গেছে। অজানা পাখির ডাকে আমার ভিতরের গান গুমরে উঠেছে। দেখেছি পথে যা কিছু পাওয়া যায় সব কিছুতেই সেই এক পরম রতন। যেন শূন্য করে ভরে দেওয়া।

এমন সময়ে জীবনে শিখা এল। প্রজাপতি জীবনে ইলা, সর্বানী নন্দিনীরা এসেছে আবার চলে গেছে। কিন্তু কেহই তাদের প্রলুব্ধ প্রচেষ্টায় আমার অভিরুচির ধারাকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। ফলে তাদের অধ্যবসায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। বলাবাহুল্য সর্বদাই সুসমাপ্তি নয়। তাদের প্রাণের লীলা স্বত্ত্বর সংশয়ের দোলায় আবর্তিত হয়েছে। অচিরেই শুরু হয়েছে তর্কের সংঘাত, যুক্তির জাল, চিন্তার দ্বন্দ্ব আর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার দীনতা। নিরন্তর প্রয়াসের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ সম্পর্কে অচিরেই ভেঙ্গে পড়ার ক্লিষ্ট আবর্তন। ফলে নারী প্রেমের বিচিত্রতায় কোনো উদ্যম পেলাম না। কেবল বিষয়ী যন্ত্রের মত আমার মনকে পীড়া দিল। তবু কি যেন খুঁজে ফিরি। সেই খুঁজে ফেরা পথের সুরে শিক্ষার সাথে আমার আলাপ। দেখি ওর জীবন প্রবাহ সম্মিলিত সুর প্রবাহের মত। আলাদা করে মূলসুর উপসুর পৃথক করা যায় না। সব বাঁধা ছিঁড়ে অভিরুচির ধারাকে সরলগতি দেওয়াতেই যেন ওর আনন্দ। ফলে প্রজাপতির ফুলে আটকে যাওয়ার মত অশুভ ইঙ্গিতের নানা উপাচার আমাকে কাহিল করে তুলল। তখনই সকল নিমন্ত্রণের মুখে ছাই দিয়ে আমার ঘুরপথে চলা শুরু। মাঝে মাঝে বিমর্ষ দিনে শিখার কথা মনে হত। বিমুখতার মধ্যে শিখার আহ্বানে আমার প্রবাস জীবনের ইতি ঘটিয়ে ফিরে আসতাম পরিচিত মহলে আবার দীন কয়েকের মধ্যে বিরক্ত হয়ে বদ্‌মেজাজি আমি চলে যেতাম।

অনেকটা অর্থনৈতিক মন্দাতে আর্টিফিসিয়াল স্টিমুলেশন এর মত। মনে ভাবতাম এটুকু প্রাণের খেলা আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় অপচয়।

(২)

এমন ভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। প্রতিদিন তৃপ্তিহীন একই লিপি বারে বারে পড়ব না বলে আমি এই আছি এই নেই এমনভাবে চলতে থাকলাম। যেন ঢল্ নামা নদীর তরতরিয়ে বয়ে যাওয়া। আমি শিখাকে ছাড়লাম না আবার ধরলাম ও না। শিখা ও আমাকে ধরলও না ছাড়লও না। যেন ঘরের দু-দিকের দরজা খোলা। চাইলেই চলে যেতে পারি কিন্তু যাচ্ছি না। দুদণ্ড বসে গল্পে মেতেছি আবার চোখ কুঁচকে বাইরে বেলা পড়ে এল কিনা দেখার ঘটা। মন ঘরেও রইল না পারেও রইল না। বেশ রঙ্গ। সম্পর্কের জানালা দিয়ে অনন্ত আকাশ হাতছানি দেয়। যেন উঠিউঠি করেও ভব্যতা করে বসে থাকা। শিখার পরিচিত মহলে আমার নাম হল 'হাওয়া বাবু'। অধমের হাল দেখে সবাই হাসাহাসি করে। আমি ও এমন জুতসই নাম পেয়ে খুশি হই। ইতিমধ্যে দেখলাম শিখার বেশ কিছু প্রেমিক জুটেছে। শিল্প সাহিত্যে তারা সবাই উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাদের কথার ঢঙ যেন একটু অন্যরকম। সর্বদাই কুটুস কুটুস কামড়ায়। পরস্পরের সাথে তাদের সম্পর্কটা অনেকটা ঢেঁ-কুচকুচের মতো। শিখা যার সাথে ঘোরে সেদিকটা নেমে যায় উল্টোদিকে অন্যরা বসে ঘাড় উঁচু করে দেখতে থাকে। শিখার পক্ষপাতিত্ব আর ছেলেটির নির্লজ্জতার কথা পরস্পর ঢেকুর তুলতে তুলতে আলোচনা করে।

আর আমি নির্লিপ্ত চোখে ঠুলি পরা ভালোমানুষটা সেজে তাদের পরস্পরের প্রতি উৎসারিত দগ্ধানো মুখ দেখতে থাকি। কোনো সাধনা নেই (প্রতিভার কথা নাই বা বললাম) সারাক্ষণ তারা তাদের প্রেমিক সত্তাকে পরস্পরের ঈর্ষার ক্লেদাক্ত কথায় গনগনে রাখে। শিখার ব্যর্থপ্রেমিকরা আমার সঙ্গী হত। তারা আমার সাথে তাদের একাকিত্ব ভাগ করে নিত। আমি মনে মনে বেশ তৃপ্তি অনুভব করতাম। ভাবতাম যে খুশি শিখার প্রেমে পড়ুক ক্ষতি নেই কেবল ও যেন কারুর প্রেমে না পড়ে।

(৩)

আমাদের বাদা অঞ্চলের রায়চৌধুরীরা স্বাধীনতার পূর্বে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তারা এমন একখানা ভারিক্কি খেতাব অর্জন করেছিল। তাদের কয়েক পুরুষ কেতাবি বাবুয়ানার মধ্যে দিন অতিবাহিত করে উত্তর পুরুষের জন্য যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল তাতে সাবেকি চমক বজায় রাখা ছিল দুঃসাধ্য। স্বাধীনতার পর হতে তাদের খ্যাতি ক্রমশঃ বিলীয়মান। প্রতীপের তেল ফুরাবার আগে উত্তর পুরুষরা শিক্ষা দিক্ষায় মনোযোগ স্থাপন করে এবং অল্পকালের মধ্যে বাংলার শিক্ষাজগতে উজ্জ্বল স্থান দখল করে।

আমার বন্ধু সুকান্ত সেই রায়চৌধুরী পরিবারের ছেলে। সুকান্তর বাবা সায়েন্স কলেজের প্রথিতযশ অধ্যাপক। সত্তরের দশকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসায় সুকান্তদের অনেক জমি সরকার দখল করে। বিনা চেষ্টায় কিছু জমি সাধারণ লোকের হাতে এসে যাওয়ায় তাদের কি ভালো হল জানি না সুকান্তদের প্রতিপত্তি আরো কমে গেল। পিতৃপুরুষের গৌরব হ্রাসে সুকান্ত শূন্যভাণ্ডারকে জ্ঞানের ভাণ্ডারে পরিণত করার বাসনায় উঠে পড়ে লাগল। স্কুল কলেজে বরাবরই প্রথম স্থান দখল করতে থাকল। কয়েক বছরের মধ্যে সুকান্ত উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ পাড়ী দিল। স্কুল কলেজে পড়ার সময় সুকান্তর সাথে আমার রাজনৈতিক আদর্শ মিলত। মনে পড়ে ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে ও প্রথম গরীব ছাত্রদেরকে বিনা পয়সায় পড়ানোর জন্য মানবতাবাদী কেন্দ্র গড়ে তোলে। এবং আশ্চর্যজনকভাবে পারিবারিক গণ্ডির বাইরে এসে ওকে বলতে শুনেছি সমাজতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ওর উত্তরোত্তর অগ্রগতিতে আমরা বন্ধু হলেও ওকে শ্রদ্ধা করতাম।

বিদেশে যাওয়ার পরে ওর সাথে আমার যোগাযোগ ক্ষীণ হতে থাকে। শেষ কয়েকবছর গভীর রাতে মাঝে মাঝে ও ফোন করত। আমাদের যখন রাত বারোটা ওদের তখন দুপুর। ওর কথার সূত্র ধরে বুঝতাম ও রিসার্চ কমপ্লিট

করে এখন বিখ্যাত বহুজাতিক কোম্পানির সফল টেকনোক্র্যাট। আমার খুব গর্ব হত। অনেককে শুনিয়ে শুনিয়ে ওর কথা বলতাম। শিখাকেও বলেছি। টেলিফোনে ওর সাথে ছোটবেলার মত তর্ক করতাম। বুঝতাম ওর রাজনৈতিক দর্শন পরিবর্তন হয়েছে।

ইদানিং ওর সাথে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদল নিয়ে বেশি কথা হত। ওর কথায় জমি আন্দোলন হল 'অ্যান্টি মনোপলি, অ্যান্টি বিগ ল্যান্ডলর্ড ডেমোক্রাটিক অ্যাসপিরেশন।' আমি বলতাম, যে জমির মালিকরা আন্দোলনের বাহিরে থেকে গেল এমনকি আন্দোলনকে মদত দিল তারাও মনোপলি বিগ ল্যান্ডলর্ড। শেষের দিকে ও রেগে যেত। রেগে গিয়ে ও আমাকে বলত উন্নত দেশের উন্নতির কথা আর আমাদের রাজ্যের পিছিয়ে পড়ার কারন। এবং প্রতিকার এর জন্য আমাদেরকে দায়ী করত। ওর কথায় আমরা অনেকদিন শাসক শ্রেণীকে 'এ্যাপিজ' করে এসেছি। ওর অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করে আমি কষ্ট পেলেও ভাবতাম ও তো পৃথিবীকে অনেক বেশি দেখেছে তাই এসব বলার হক্ ওর নিশ্চয় আছে। কমিউনিষ্ট শাসিত দেশ অপেক্ষা ধনতান্ত্রিক দেশে যে শ্রমিক শ্রেণী আরো ভালো থাকে তাদের অধিকার আরো আরো বেশি রক্ষিত হয় সে কথা উদাহরণ সহযোগে ও আমাকে বুঝাতে থাকে। আমার চরিত্রে রাগ এবং কৌতুকপ্রিয়তা খুব পাশাপাশি থাকে বলে সব রাগ অদ্ভুত কৌতুকে রূপান্তরিত করে সুকান্তর সাথে আমি দিব্যি রসিকতা করে যাই। একদিন শুনলাম সুকান্ত দেশে ফিরছে। ইতিমেধ্য এরাজ্যে ও রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে গেছে। আমার ভালো লাগল সুকান্ত ফিরছে। সেই কতদিন পর আবার কফিহাউসে জমিয়ে তর্ক হবে। তাতেও যতই আমাকে 'ডিস্পার্টার' বলে অপমান করুক।

(৪)

মাস-খানেক পরে সুকান্তর সাথে রবীন্দ্রসদন নন্দন চত্বরে দেখা। পরিবর্তনের শিক্ষা কমিটিতে সুকান্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তখন চলচ্চিত্র উৎসব চলছিল। সুকান্ত উৎসবে ছবি দেখতে এসেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল কেমন দেখছি উৎসব। আমি বললাম ছবি দেখছি না তবে উৎসব দেখছি। এবারের উৎসব নাকি জনগণের উৎসব। ও বলল 'খুব ভালো লাগছে। নেতা এবং জনগণ কেমন ইন্টারওভেন হয়ে গেছে। অ্যালায়েন্স উইথ দ্য হোল অব দ্য পিপল।' বিচ্ছিন্ন আঁতেলদের দেখা নেই।'

আমি বললাম, 'সত্য ও সুন্দরের উপস্থিতি। অনেকটা 'অ্যালায়েন্স উইথ দ্য হোল অব দ্য পেজেন্ট্রি'। সুকান্ত রেগে গেল। কিন্তু আমি ওকে উৎসবের চারিত্রিক পরিবর্তনটা বোঝাতে পারলাম না।

উৎসবে শিখার সাথে সুকান্তর পরিচয় করিয়ে দিলাম। সুকান্তের উৎসব সংক্রান্ত বিশ্লেষণের উপর রাগে আমার এই অদ্ভুত কৌতুক। পূর্বে বলেছি রাগ এবং কৌতুক আমি একইসাথে বহন করি। সুকান্ত ও শিখাকে ছবি দেখতে পাঠিয়ে আমি বাইরে বসে থাকলাম। চা খাচ্ছিলাম। শিখার 'ক' বাবু 'খ' বাবুদের সাথে অন্য কৌতূকে মেতে উঠলাম।

'ক' বাবুর সাথে আলোচনা করলাম চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ না করার মধ্যে কতটা প্রগতিশীল ভাবনা বিদ্যমান আর 'খ' বাবুকে বললাম চলচ্চিত্র উৎসব কতটা সংস্কৃতিক বিপ্লবকে রিদ্ধ করে। বলা বাহুল্য বরাবরের মত 'ক' বাবু এবং 'খ' বাবু আমাকে বোকা ঠাওর করে খানিকটা কৌতূক আর সহানুভূতি জানিয়ে চলে গেল। সুকান্তর কথায় 'টিক্লিস্ অ্যান্ড মাড্ল হেডেড ইনটেলেক্টুয়াল বাঙ্গলিং।'

(৫)

কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করেছি শিখার সাথে সদ্ব্যবহার করব। কখনও মুহূর্তের জন্য বিরক্ত হব না। কিন্তু এসব 'ক' বাবু 'খ' বাবু প্রভৃতির মাঝে সব কেমন গুলিয়ে যেত। প্রত্যহ অনাহুত অতিথির মত একরাশ বিরক্তি এসে দাঁড়ায় সামনে। প্রতিদিন সম্পর্কের উষ্ণতা খুঁজতে গিয়ে দেখি আমাদের মাঝে একরাশ চাপা অন্ধকার উঁকি ঝুঁকি মারছে। আগুন জ্বলছে মস্তিস্কে আগুন জ্বালছে শরীরে। আর আমি এবং শিখা কিংবা আমরা চতুর্দিকের মিথ্যার বলয়ে দাঁড়িয়ে আছি নিজ নিজ অবস্থানে একরাশ মিথ্যার চর্চিত ভঙ্গিতে। প্রেম আমাদের সুপ্ত মন হতে কবেই উধাও হয়েছে

তবুও মনের গহীন অন্ধকার খুলে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না। পারছি না সত্যের প্রসন্ন রোদে নিজেদের রাঙিয়ে নিতে। কেবল মিথ্যার আল্পনা কেটে ক্ষয় করছি আয়ুষ্কাল।

সেদিন বিকালে এক পশলা বৃষ্টির পর ঝলমলে রোদ উঠেছে। মনটাও ফুরফুরে। ভাবলাম আজ আমি সবাইকে ক্ষমা করতে পারি, এমনকি চাইলে করুণাও করতে পারি। হয়ত বা একটা ভাল কবিতা ও লিখে ফেলতে পারি।

ছুটে ছুটে রবীন্দ্রসদনে চলে এলাম। রাস্তার উল্টোদিকে সিটিজেন্স পার্ক-মোহর কুঞ্জ। একা ঘুরে ঘুরে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর এক জায়গায় এসে আর এগোতে পারলাম না। দেখি সুকান্তর হাতে ধরা শিখার হাত। শিখা কাঁদছে। আর সুকান্ত গভীর মতায় শিখার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে। আসলে আমিও তো এমন সম্পর্ক চেয়েছিলাম। যেখানে একের চোখের তারায় অন্যের চোখের সেতুবন্ধন ঘটবে। একের বেদনার চেতনায় নেমে আসবে অন্যের সুগভীর পরশ। আমার ফেলে আসা রোদ ও ছায়ার দিনগুলোর কথা ভাবছি। আমার আকাশ কুসুম স্বপ্নের কথা ভাবছি। দেখি আমার যাবতীয় পথের গল্প দিনশেষে ছাই হল সব হুতাশে। আমি হাঁটছি। বৃষ্টি শেষে রোদ উঠলেও পাতায় লেগে থাকা জলের স্মৃতির মত আমার নিভৃত অনুভূতির কথা গায়ে মেখে আমি আচ্ছন্ন হয়ে হাঁটছি। একপ্রান্তে গড়ে উঠেছে আর অন্যপ্রান্তে পড়ে থাকছে আমার স্মৃতির বেওয়ারিশ লাশ। বেদি বাঁধানো বটগাছটার ডালে দেখি এক অচেনা পাখি। ধূসরবর্ণের। গলার কাছে সুন্দর নীলের নকশা। ভালো লাগছে নাকি খারাপ লাগছে ঠিক বুঝতে পারছি না। সোনালী রূপালী সবুজে সুনীলে সে বড় মায়াবী পাখি। এক অচেনা আবেগ আমাকে টেনে রাখল সত্যিই তো 'তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে/কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে'। পাখিটাকে নাকি সুকান্তকে জানিনা, শুধু ফিসফিস করে বললাম 'শালা বুর্জোয়া।'

উদ্দেশ্য

তুহিন চৌধুরী
এ. ডি. এস. আর., ঝাড়গ্রাম

মনটা একরকম খারাপই হয়ে রয়েছে। বাবা অসুস্থই ছিলেন। কিন্তু একটু বেশি কেয়ারিং ছেলেটা বেশ একবছর মতো বাড়িতেই ছিল, একটা সিভিল চাকরি নিয়ে আবার ও চলে যাবে কত দূরে—এভেবেই বাবার সুগার-প্রেসার সবই বাড়ছিল। তাছাড়া যে জেলায় পোস্টিং সেখানে অতিসক্রিয় কম্যুনিষ্টদের যা বাড়বাড়ন্ত যেরকম খুন- জখম- অশান্তি-ভয়াবহতা সেসবও উদ্বিগ্ন করছিল বাড়ির সবাইকে। বাবা চলে গেলেন। বিশাল বড় বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। বাড়ির সবচেয়ে প্রাণবন্ত ছেলেটা বাইরে আর বাড়ির সবচেয়ে খিট্‌খিটে লোকটা আর নেই-ই। বাড়িতে মা কাঁদেন। বাড়ির পরিবেশটা কেমন নিঃঝুম, থমথমে।

অন্বয় বসু। রেজিষ্ট্রার হয়ে তার বেতন বেড়েছে নেট সাতহাজার তিনশ টাকা। খরচ বেড়েছে বেশি। চাকরীর শুরু। তাই ছুটিটুটি ম্যানেজ করাও অসুবিধের। এই অফিসটা ওড়িশার সীমান্তবর্ত্তী। লোকজন বাংলায় দলিল দিলেও মুখে সবসময় ওড়িয়া বলে। বাড়ির মহিলারা তো বাংলা বলতে বা বুঝতে কোনটাই পারেনা। কি আশ্চর্য! হাব-ভাব চালচলনেও বাঙালীয়ানার চেয়ে ওড়িয়া ধাঁচধারণাই বেশি। অফিস স্টাফরাও এমনভাবে ওড়িয়াতে কথা বলে যে প্রথমেই মনে হবে যেন অফিসারকে না বুঝতে দেওয়ার চেষ্টা। অফিসের লোকজনেরা যথেষ্টই ভালো। ইনফ্যাক্ট অন্বয়ের তো বহুবারই মনে হয়েছে অফিসের লোকজন, দলিল লেখক এরা 'সাহেব' বলে সম্মান করলেও ভেতরে ভেতরে ভাই বা ছেলে ভেবে কেমন একটা স্নেহও করেন। আর এই ব্যাপারটাই ওর মধ্যে একটা সুন্দর হাওয়া খেলায়। মনটা হালকা হয়ে যায়।

মনখারাপ, একা একা বোধ, বুকের ভেতরটা ভারি হয়ে থাকা এসবের মধ্যে টুকরো টুকরো কিছু ঘটনা যেন নিকষ রাতে ছোট ছোট জ্যোৎস্না বিন্দু। ভাড়া বাড়িতে ঢুকলে তো কেমন একটা আতঙ্ক। ফাঁকা দোতলার দু'তিনটে বন্ধ ঘর ছেড়ে একটা বিশাল ঘর, বাথরুম, বারান্দা, রান্নাঘর নিয়ে অনেকটা স্পেস্। চারপাশে হুমড়ি খাওয়া এতোগুলো বাড়ি যে ভুতের ভয় পাবার কিছু নেই। কিন্তু বাড়িওয়ালা ক্রমাগত আসেন আর নিজের বড় মেয়ের প্রশংসা করেন কখনো বা ছোটশালিরও। বড় মেয়েটি বাড়িতে ঢুকলেই শুরু করে গান। অফিস স্টাফের কেউ কেউ ওই মেয়েটি সম্পর্কে সাবধান করলেও, অ্যাটিটিউডের বাড়বাড়ন্তে অস্থির হয়ে মাঝে মধ্যে ভয়ও করে। বাড়িওয়ালার রেকর্ডও রয়েছে সব চমকপ্রদ। যাক্ এসব আতঙ্কের মধ্যেও চলছে একার সংসার, চাকরী।

একবছর একাদশী পালনের বিধান, একাদশীর আগে থেকে স্টাফেদের বিভিন্ন সৎ পরামর্শ দান, কমিশনে গিয়ে কর্পূরের সরবৎ, হাতে গড়া নারকেল নাড়ু খাওয়া যায়। গ্রামের খানদানি মুসলমানরা দলিল দাখিল করে কানে আতর দেয় হাকিম সাহেবকে। এই সবই অনেক বড় পাওনা।

ছোট্ট অফিস, কাজের চাপ নেই, কিন্তু কাচের ঘরে সকলের সামনে চেয়ারে বসে জেগে থাকতে হয়। কখনো রেজিষ্ট্রেশন সফ্‌টওয়ারের বিভিন্ন মেনুগুলোকে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখা আবার কখনো নিবন্ধন আইন বা স্ট্যাম্প অ্যাক্টের বইটার পাতা উল্টানো। চৈত্রমাস, চাপ আরো কম, জমিজমা বিকাবে না এইমাসে, অবশ্য খুব একটা দরকারে না পড়লে। ফাঁকা অফিসে বসে আছে অন্বয়। হঠাৎ এক বুড়ি, কান্না মেশানে চিৎকার, কতো অভিযোগ না অনুনয় না আবেদন কি সে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। খালি বলছে—"মোর সোবু লেইলেলা, মোর সোবু লেইলেলা"উস্কোখুস্কো চুল, কালো

আর নোংরাটে হলুদ রঙের জংলা ডুরে শাড়ি। কাচের ঘেরা ঘরের সামনে এসে হাত নাড়িয়ে যেন অনেককে দেখিয়ে কিসব বলতে লাগলো নাগাড়ে। চোখপাকিয়ে কি যে বলছে, অঝোরে কাঁদছেই বা কেন কিছু বুঝতে না পেরে অন্বয় হাঁক দেয়—

—তাপস, রাধাবাবু একটু শুনুন তো প্লিজ।

—স্যার.....

—দেখুনতো কাঁদছেন আর কি যে বলছেন বুঝে একটু বলুন তো।

ওড়িয়ায় একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকে তাপস। বুড়ি নোংরা ছেঁড়া থলের ভেতর থেকে বার করে তিন চার খানা খাজা হয়ে যাওয়া দলিল। সঙ্গে বিভিন্ন দাগের জন্য একতারা পর্চা। দলিলগুলো ফ্যাকাসে নীল কালিতে লেখা বাংলা দলিল। পড়ে বেশ গেল তিন চার পুরুষ থেকে পেয়ে ক্রমান্বয়ে, শ্বশুর তার পুত্রবধূকে জমি দিয়ে ছিলেন বিভিন্ন দাগের মোট ১ একর ৪৪ ডেসিমেল জমি। তার মধ্যে জল জমি ছাড়াও বাস্তু ও বরোজের মতো মূল্যবান বহুজমিও আছে। পর্চ্চাও রয়েছে বনী পৈড়ার নামে।

তাপস এবার তর্জমা শুরু করল—

স্যার, এনার তিন মেয়ে, খুব ছোট বয়সেই পরপর তিন মেয়ে হয়ে গেছে এনার। ছোট মেয়ে হবার ক'দিন আগে এনার স্বামী মারা যান। শ্বশুর এনাকে বেশ কিছু জমি, একটা বাড়ি আর গয়না দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনটে মেয়েই পড়াশুনো শিখেছে। মেজ মেয়েটা হেলথ সেন্টারে কাজ করে।

—হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে সেটা বল!

রাধা বাবু শুরু করেন—স্যার আমি এনাকে চিনি, আঁতলার কাছে বাড়ি। আগে অনেক জমি জমা ছিল, মাঝখানে লোকের বাড়িতে কাজও করত। এখন তো ভিখারির মতো ঘোরে।

—নাম কি?

—বনি জানা।

—বুঝছি, এর নামে ঐ সব জমি, তা এখন কি হয়েছে?

তাপস—স্যার, ওর মেয়েদের ওর সোনা, বাসন, জমি সব দিয়ে দিয়েছে। কিছুটা জমি ওর নিজের জন্য রেখেছিল। এখন সেটাও মেয়েরা নিয়ে নিচ্ছে যে রাস্তা করবে বলে।

—প্রথম কথা মেয়েদের মানুষ করেছে। বিয়ে দিয়েছে, জমিও দিয়েছে। আবার নেবে কেন? আর তাছাড়া এঁকে এখন দেখাশুনো করে কে? আর ইনি না দিলে নিয়েটা নেবে কে?

আবার মহিলাকে দুর্বোধ্য ভাষাতে জিজ্ঞাসা করা হয়। জানা যায় মহিলার বর্তমান জমিখানার ওপর দিয়ে রাস্তা করবার জন্য দলিল লিখছে। ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার না হওয়ায় এবার জিজ্ঞাসা করা হল বুড়িকে এখন দেখে কে।

মহিলা আবার হাকিমের কাছে হাত নেড়ে চোখের জল ফেলে অভিযোগ জানাতে থাকলো—'আমাকে দেখবে এই বলেই না তোমার কাছে মেয়েদের নামে জমি লিখে দিয়েছি। এখন ওরা যে কেউই দেখছে না, তাহলে জমি আমাকে ফিরিয়ে দাও!' কি মুশকিলের চাকরিই না করতে এসেছে অন্বয়। একটু বিরক্তিও এলো। কিন্তু আরো বিসদে জানতে চাইল রাধাবাবুর কাছে।

রাধাবাবু খোঁজ নিয়ে জানলেন শ্রীকান্ত পৈড়ার সেরেস্তায় দলিল লেখা হচ্ছে, চায়ের দোকান থেকে জানা গেল

বুড়ির জমিটা সামনের অংশে। আর তিন মেয়েকে বুড়ি জমিটা দিয়েছিল পেছন এবং ধারের অংশে। ওদের নিজস্ব কোন রাস্তা বলতে কিছু নেই। বুড়ির জমির ওপর দিয়েই বাড়িতে ঢুকতে হয়। প্রথম প্রথম সব মেয়েরাই পালা করে ভাত দিত। তারপর বিভিন্ন অশান্তির পর মেজমেয়ে মায়ের থেকে আরো একটু বেশি জমি চেয়ে নেয় এই ভরসা দিয়ে যে ওর কাছেই মা সারা জীবন খাবে। কিন্তু সকালে দুটো মুড়ি দিয়ে মেয়ে চলে যায় হেলথ সেন্টারে। সন্ধ্যে গড়িয়ে মেয়ে ফেরে বাড়িতে। সেই রাতে দুটো ভাত। আগে জামাই করত, এখন মেয়েও খুব খারাপ ব্যবহার করে। জামাই সেদিন চুলের মুঠি ধরেছে।.....

আর যেন শোনাই যাচ্ছে না। চেয়ার ছেড়ে সটান উঠেই পিওনকে ডাক—

—অমলবাবু, ডাকুন তো, ডাকুন তো দেখি একবার শ্রীকান্ত পৈড়াকে। এক মিনিটও যেন দেরি না হয়। বলুন এক্ষুনি ডেকেছি।

মোটামুটি ততক্ষণে সেরেস্তাতে খবর রটে গেছে। একটু ভয় পেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বয়স্ক ধুতিপরা চিমড়ে দলিল লেখক এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালো।

—সার, ডেকেছেন?

—ইনি কাঁদছেন কেন?—একটু রূঢ় হয়েই বলল অন্বয়।

এক্কেবারে না বোঝার ভান করে—সার আমি.....মানে.....সার এর মেয়েদের জমি সার.....

—ইনি কাঁদছেন কেন? আর কি দলিল লিখছেন?

—সার এর মেয়েদের এজমালি জমি সার। ওরা নিজেরা সবাই মিলে মেজ বোনকে ওই জমিটা দিচ্ছে আবার ঘোষণাপত্র বলে নিজেদের ব্যবহার.....সার ফুলস্ট্যাম্পে লেখা হচ্ছে সার।

—এজমালি জমি। তার পর্চা আছে তো? আগের চেন দলিল আছে?

—সার, মানে ওগুলো অত.....সার মেয়েদের ডাকছি সার।

—দাঁড়ান, কতটাকা পাবেন এই দলিল লিখে? এই মহিলা কাঁদছেন আর তিন-চারশো কি বড়জোর হাজার টাকার জন্য এধরনের কাজ করছেন?! পর্চা, দলিল না দেখে দলিল লিখেছেন, আপনার.....কি বলব!....., দলিল লেখা কি কমপ্লিট, দেখি আনুন আর ওর মেয়েদেরও ডাকুন। বলবেন আমি পুলিশে দেব সবগুলোকে।

ততক্ষণে অফিসের স্টাফ, অন্যান্য, কয়েকজন, বিভিন্ন সেরেস্তার লেখক, তাদের সহযোগী মিলে ভিড় করেছে। সবাই চুপ। ছেলেমানুষ অফিসার, হাসিখুশি মেজাজের। তার এমন কঠোর রূপ দেখে সবাই একটু হকচকিয়েই গেছে। এজলাসের পাশে সেই বুড়ি তখন চুপটি করে বসে। শ্রীকান্ত পৈড়া কয়েজনকে নিয়ে ছুটেই প্রায় ঢুকলো ধুতি গুঁজতে গুঁজতে। এরা সব মেয়ে জামাই।

—সার এরা এই ঘোষণাপত্র দলিলে.....

—দেখি।.....এই জমির আসল মালিক কে আপনারা (ঐ মহিলাদের উদ্দেশ্যে)? কি ডকুমেন্ট আছে?

শ্রীকান্ত পৈড়া বলল— সাহেবেরো কাছে সবো সত্যি সত্যি বলি দাও। অনর্থ হই যাবো। প্রচণ্ড রেগে রয়েছে অন্বয় কোন কথা না শুনেই চাপিয়ে দিল নিজের কথাগুলো— আমার কাছে খবর আছে যে, যে জমিটাকে আপনারা এজমালি বলছেন ওটা আপনাদের নয়। ওটা আপনাদের মায়ের। শুনতে পেলাম আপনারা মাকে দেখেন না। দুবেলা

খেতে দেন না। অথচ যথেষ্ট জমির মালিকানা ছিল ওর। অপনাদেরকে যেসব দানপত্র দলিলে আপনার মা জমি দিয়েছিলেন সেগুলো কিন্তু মাত্র পঁচিশ টাকায় ক্যানসেল হয়ে যেতে পারে। সে কথা বোধ হয় আপনারা জানেন না। তাছাড়া যেসব কথা শুনলাম তাতে আমি এক্ষনি পুলিশ ডাকতে পারি এবং কোর্টে পুরো ম্যাটারটা রেফার করতে পারি।

অন্বয় বলছে আর ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারছে, কতটা সঠিক বলছে ও। তাছাড়া কতটা ক্ষমতাই বা ওর আছে। আইনের বাইরে গিয়ে এভাবে অতিসক্রিয়তা হঠাৎ নিজেকেই দংশন করল। কিন্তু চোখের সামনের ছবি আর মনের ভেতর অস্বাভাবিক আন্দোলন—নিজেকে বেঁধে রাখতে পারল না। গম্ভীর ভাবে বলল —এই দলিল আমি দাখিল নেব না। সদর অফিসেও এবিষয়ে ইনফর্ম করে দিচ্ছি। আর শ্রীকান্ত বাবু সঠিক কাগজপত্র ছাড়া এধরনের কাজের জন্যে কিন্তু নেক্সট টাইম অ্যালার্ট থাকবেন।

সবাই বেশ ভয়ই পেয়ে গেছে। চুপচাপ পরিবেশের মধ্যে ছোট্ট অফিসটায় হাল্কা চাপা গলায় বিভিন্ন কথা, আস্তে আস্তে দু'একটা গলা শোনা গেল—সাহেবের বিচার..... ভাবাই যায় না।

এন্ট্রি অপারেটের তাপসকে একটু বন্ধু সমতুল্য মনে হয়েছে অন্বয়ের বরাবরই, তাপস দু'পুরের দিকে এসে একবার বলল—স্যার সবাই কিন্তু আপনার জাজমেন্টে খুবই আপ্লুত। বুড়ির মেয়েরা আর শ্রীকান্তবাবু তো দারুণ ভয় পেয়েছে। আর ওদের সেরেস্তায় স্যার বরাবর যা ভুলভাল হয়ে থাকে স্যার.....

—তাপস, দাখিল না নেওয়ার, অন্ততঃ এইধরণের গ্রাউন্ডে আমাদের কিন্তু কোন ক্ষমতা নেই। অন্যান্য ভ্যালিড গ্রাউন্ডে আমরা দলিল পোন্ডিং রাখতে পারি, বুক-টুতে এন্ট্রি করতে পারি, ডি.আই.জির কাছে ফরওয়ার্ড করিতে পারি—এইসব। এভাবে ধমকে চমকে খারাপ বা ভালো কোন কাজই কতটা ঠিক—ঠিক বুঝতেও পারি না। তাছাড়া সরকারের রেভিনিউ-এর প্রশ্নও রয়েছে.....

—স্যার, আমার বাবা-মা রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত। বাবা ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত। বই-পত্রও পড়াশুনো করেন। বাবার একটা কথাকে আমি সবসময় মনে রাখি। উদ্দেশ্য যখন মহৎ তখন সবকিছুই সঠিক। স্যার, এ কিন্তু আপনার সামনে বলতে চাইনা কিন্তু আমরা আপনাকে এই অফিসে আমার পর থেকে দেখে আমরা বুঝেছি.....।

এ নিয়ে আর কোন কথা কারুর সঙ্গে হয়নি। কোন পাপবোধ নাকি অজানা আশঙ্কা নিয়েই ঘাড় নিচু করেই শ্রীকান্ত পৈড়া দুতিনটে দলিল দাখিলের সময় পাশে ছিলেন এই কদিন। তিনচারদিন পরে আর একটি বিক্রয় কোবালা নিয়ে হাজির। কোবালা মূল্য পনের হাজার টাকা। সম্পাদনকারী বনি জানা। চোখ গোল গোল করে বুড়ি পাশে দাঁড়িয়ে ভিজে বেড়ালের মতো।

শ্রীকান্তবাবু—স্যার নমস্কার, এ এর মেয়েদেরকে এই তিন ডেসিম্যাল জমি বিক্ছে।

ভেতরের লেখাগুলো ভালোভাবে পড়ে এ্যাসেসমেন্টের সঙ্গে তপশিল মিশিয়ে অন্বয় প্রশ্ন করল।

—বনি জানা, টিপ দিয়েছেন? মেয়েদের বিক্রি করছেন? কত জমি। ওরা জমি নিয়ে কি করবে? মেয়েরা কি ভয় দেখিয়ে বা অন্য কোনভাবে চাপ দিয়ে জমি লেখাচ্ছে? এই পুরো টাকাটাই পেয়েছেন তো? সব প্রশ্ন-উত্তরের ইন্টারপ্রিটর হিসাবে কাজ করল রাধাবাবু। শ্রীকান্তবাবু বেশ গরিমান্বিত। বললেন—স্যার বুড়ির অনেক টাকা স্যার। এই পনের হাজারও পোস্টাপিসে রাখবে বলেছে স্যার। এই, সাহেবকে পোস্টাপিসের বই দেখিয়ে নিয়ে যাবে!

এগারোটা দলিল হয়েছে আজ। তাই অফিসটা বেশ ভরাভরা, বুধবার বেশি রেজিষ্ট্রী হয়। স্টাফেরাও কর্মব্যাপ্ত। এই দলিলটার জন্য অন্বয়ের মনটাও বেশ খুশি খুশি। বেশ হাল্কা.....একটা ফুরফুরে মেজাজ।